| | | |
|---|---|---|
| College Name | : | Raja N.L. Khan Women's College (Autonomous) |
| Teacher's Name | : | Dr. Sujoy Kumar Maity |
| Department | : | Bengali |
| Class | : | 4th Sem P.G. |
| Subject | : | Bengali |
| Paper | : | 402 |

**Title of Topic ঃ প্রাচ্য সাহিত্যতত্ত্ব**

## ১। পাশ্চাত্য স্টাইল ও ভারতীয় রীতি

'কাব্যজিজ্ঞাসা'য় রীতিবাদ একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলেও কাব্যের আত্মা নির্ণয়ে শেষ পর্যন্ত রীতিবাদ গৃহিত হয়নি। রস এবং ধ্বনি সাহিত্যতত্ত্বের পাঠক এবং লেখকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। তাই অনেকে মনে করেন, 'পাশ্চাত্যের স্টাইলে'র আলোচনা যতটা এগিয়েছে, রীতির আলোচনা ততটা এগোয়নি। কিন্তু পাশ্চাত্য Style ও ভারতীয় রীতি যে এক বস্তু, এ বিষয়ে আংশিক সত্যতা মেলে। ইউরোপে Style-এর প্রথম আলোচনা করেন গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল। তিনি তাঁর কাব্যে শব্দ বা ছন্দ ইত্যাদি নিয়ে প্রাচীন Style ধারণার উপহার দিয়েছেন। তারপর নানা মনীষীর হাতে Style-এর ধারণা বিবর্তিত হয়েছে। একদল মনে করেন– "Proper words in proper place".
– একেই তাঁরা বলেছেন Style। এখানে 'ভারতীয় রীতিবাদ' অর্থাৎ, পদরচনার বিশিষ্ট ভঙ্গি বা কাব্যিক অবয়বে শব্দ সংস্থান-এর সঙ্গে ইংরেজী Style-এর মিল আছে মনে হয়। কিন্তু বুঁফো বলেছেন– 'Style is the man himself'
ভারতীয় রীতিবাদ যেখানে কাব্যের বহিরঙ্গ আলোচনায় মনোযোগী, সেখানে বুঁফো বলতে চেয়েছেন যে লেখকের মনই Style রচনা করে।

প্রাচ্যের রীতি ও পাশ্চাত্যের Style সমার্থক নয়। কেননা রীতি বলতে দেশ ও কালের বিস্তৃত উপভাষা প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। আবার অ্যারিস্টটল Style-এর তিনটি ভাগ করেছে– (i) Grand, (ii) Middle, এবং (iii) Low। এই ধরণের বিভাজন ভারতীয় কাব্যতত্ত্বে নেই। একে বলা যেতে পারে আধুনিককালের সমাজ, ভাষা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রাচীন রূপ। কিন্তু পাশ্চাত্য Style এবং ভারতীয় রীতির মধ্যে একস্থানে মিল আছে। তা হল Style এবং রীতি সর্বত্রই বাক্যের শব্দ ও পদ কীভাবে কাব্যের অবয়ব গড়ে তোলে, সে বিষয়ে আমাদের ধারণা দান করে। তাই এই রীতি কাব্যের আত্মা নয়, বরং বলা যায়, রীতি কাব্যের আত্মার অনন্য এক পদ্ধতি।

## ২। রীতিরাত্মা কাব্যস্য

কাব্য কি, কাব্যের আত্মা কি – এ বিষয়ে নানা প্রশ্ন প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের আলোড়িত করেছিল আর সেখান থেকেই কাব্য জিজ্ঞাসা শুরু। দেহাত্মবাদী আলঙ্কারিকেরা বলেন, অলঙ্কৃত অর্থ সমন্বিত বাক্যই কাব্য, – এছাড়া আর কিছু নয়। কাব্যের তনু দেহটিকে মনোহারী কথার জন্যে তাকে নানা আভরণে সজ্জিত করলেই তার রূপ ও চারুত্বের প্রকাশ ঘটে যায়। যেমন– "মধুর হলো বিধুর হলো, মাধবী নিশীথিনী" এই উক্তির মধ্যে অলঙ্কারের সৌন্দর্য কাব্যের কান্তিকে প্রকাশ করেছে। কিন্তু এই দেহাত্মবাদী আলঙ্কারিকদের প্রতিপক্ষগণ বলেন যে, কাব্য অলঙ্কৃত না হয়েও চারুত্ব প্রকাশ করে। যেমন,– রবীন্দ্রনাথের 'শেষ চিঠি' কবিতায়–

"অমলার ঘরে বসে আখোলা চিঠি খুলে দেখি
তাতে লেখা—
'তোমাকে দেখতে বড্ডোইচ্ছে করছে'।
আর কিছুই নেই।"

– এই প্রতিপক্ষ মতাবলম্বীগণ বলেছেন কাব্যের আত্মা অলঙ্কার নয়– রীতি অর্থাৎ স্টাইল। এই 'রীতি' কি ? আলঙ্কারিক বামন বললেন– "বিশিষ্টা পদরচনারীতিঃ।
বিশেষো গুণাত্মা।"

– অর্থাৎ পদরচনার বিশিষ্ট ভঙ্গি হল রীতি, মাধুর্যাদিগুণ এর সঙ্গে একাত্ম। রমণীর নির্দোষ অবয়ব সংস্থান থাকলে, তাতে অলঙ্কার ধারণ করলে সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়। রীতি হল সেই নিখুঁত অবয়ব সংস্থান। কাব্যের সেই সংস্থানের উৎকর্ষকে রীতি বলা যায়। যেমন, সনেট সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমরা বলি, তা হল ১৪ টি পংক্তির সুন্দর কবিতা। প্রমথ চৌধুরী তাকে এক অপূর্ব ভঙ্গিতে বলেছেন–

"বিগাঢ় যৌবনা তরী আকারে বালিকা
পরিণতি দেহখানি আঁটসাঁট ক্ষুদ্র
শিশির ধাতুর শুভ্র মসৃণ রৌদ্র
পরিণত গড়ে তোলা স্বর্ণ পাঞ্চালিকা।"

তাই রীতি হল কাব্য। এখানে আছে পদসমূহের এক বিশেষ ধরণের বিন্যাস। 'সাহিত্য দর্পণে'র একটি উক্তিতে বিশ্বনাথ কবিরাজ এই রীতি সম্পর্কে বলেছেন–

"রীতয়ঃ অবয়ব সংস্থান বিশেষবৎ,
অলঙ্কারাশ্চ কটক-কুণ্ডলাদিবৎ"

'বক্রোক্তি জীবিত'কার আলঙ্কারিক কুন্তক একহিসেবে রীতিবাদের সমর্থক। তিনি বলেন, রীতি কেবল বাইরের অবয়বসংস্থান মাত্র নয়, তা কবিস্বভাব অর্থাৎ, কবির সহজাত সংস্কার, অর্জিত জ্ঞান এবং অভ্যাসের প্রতিফলন। কবির অন্তঃপ্রকৃতির প্রেরণাবশেই এর উদ্ভব। কুন্তকের এই উক্তি আধুনিক কালের ওয়াল্টার পেটারের 'Style is the man'-এর মতোই। পেটারের মতে, রীতির লক্ষ্য হবে রসপ্রকাশে সাহায্য করা। যেমন–

"দানব নন্দিনী আমি, রক্ষঃ কুলবধূ;
রাবণ শ্বশুর মম মেঘনাদ স্বামী,–
আমি কি ডরাই সখী ভিখারী রাঘবে ?"

– এখানে রৌদ্র রস প্রকাশিত হয়েছে। এই রস রীতি ও গুণের নিয়ামক হয়েছে। সুতরাং, রীতির ধর্ম হল রসকে পরিপুষ্ট করা।

সমালোচক হার্ডসন 'An Introduction to the study of Literature' গ্রন্থে বলেছেন–

"Style is fundamentally a personal quality ... All the factors which combine in the making of a man will subtly play their parts in giving to his style it's well - defined individuality of form and colour; all the phases of his outer and inner experience will register themselves in it."

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'শেষের কবিতা'-য় ঠিক এই অর্থেই কালচার (culture) কে বলেছেন– "'স্টাইল'; স্টাইল হল মুখশ্রী।" কবি ঈশ্বরগুপ্ত একটি কবিতায় বলেছেন—

"অগ্নি জল বায়ু আছে, আছে চাকাকল।
চালাতে জানিনে আমি হয়েছি বিকল।।"

–একথা সত্যই যে চালানোর কৌশল না জানলে উপকরণ অর্থহীন। সাহিত্যও তেমনি শব্দ, অর্থ, অলঙ্কার– সবকিছু থাকলেও লেখকের যদি রীতি বা স্টাইল সুশ্রী না হয়, তবে তা কাব্য হয় না। এই প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি, রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য' গ্রন্থের একটি উক্তি। সেখানে তিনি বলেছেন—

"দীঘি বলতে জল ও খনন করা আধার – দুইই একসঙ্গে বুঝায়। কিন্তু কীর্তি কোনটা ? জল মানুষের সৃষ্টি নয়, তাহা চিরন্তন। সেই জলকে বিশেষভাবে সর্বসাধারণের ভোগের জন্য সুদীর্ঘকাল রক্ষা করিবার যে উপায়, তাহাই কীর্তিমা মানুষের নিজের।"

অতএব লেখকের কৃতিত্ব তাঁর স্টাইলে, শব্দে বা অলঙ্কারে নয়।

রীতিকে যাঁরা কাব্যের প্রাণস্পন্দন বলেছেন, তাঁরা ভ্রান্ত নন। কবির সৃজনকর্মে রীতি অপরিহার্য অঙ্গ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। রচনারীতির মধ্যে কবির অতি সূক্ষ্ম মানস-প্রকৃতিটি ফুটে উঠে। তাই এক কবি থেকে অন্য কবির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সহজেই সূচিত হয়। কালিদাসকে যে আমরা ভবভূতি বলে মনে করি না, বঙ্কিমচন্দ্রকে যে বিদ্যাসাগর বলে মনে হয় না, রীতির স্বাতন্ত্র্যই তার মূল কারণ।

অনেকে মনে করেন কেবল বিষয়বস্তু, কিংবা বাকভঙ্গিকে আশ্রয় করেই রীতির প্রকাশ ঘটে। বস্তুতপক্ষে তা নয়, কাব্যের যে কোন অঙ্গ, উপকরণ, এমনকি আত্মা রসকে আশ্রয় করেও রীতির প্রকাশ ঘটতে পারে। আসলে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করাই হল রীতির কাজ। এই বৈচিত্র্য যে কোন বস্তুকে অবলম্বন করে প্রকাশ পেতে পারে। কুন্তকাচার্য দেখিয়েছেন বর্ণ, পদার্ধ, পদ-বাক্য প্রকরণ, প্রবন্ধ প্রত্যেকটির মধ্যে উক্তি-বৈচিত্র্য প্রকাশ করতে পারে। 'রীতি'র ধর্মকে আরো প্রসারিত করলে দেখা যায়, কাব্য সৃষ্টির যে কোন বিষয়ে রীতিআশ্রয়ী ভঙ্গি অভিব্যক্ত হতে পারে। ভারতচন্দ্রের বিশিষ্টতা তাঁর বাক্যশ্লেষে, বঙ্কিমচন্দ্রের বিশিষ্টতা তাঁর আদর্শবাদে, রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্টতা তাঁর সীমার মাঝে অসীমের লীলাউপলব্ধিতে, শরৎ চন্দ্রের বিশিষ্টতা তাঁর রচনায় জীবনের প্রতি দরদে, প্রমথ চৌধুরীর বিশিষ্টতা তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত শাণিত কথায়। ফলে, বিষয়বস্তু, অলঙ্কার, ছন্দগুণ প্রভৃতিকে অবলম্বন করে রীতির প্রকাশ হলেও এর মধ্যে প্রধানত থাকে ভণিতি বৈচিত্র্য, মননের বিশিষ্টতা, সৃজনকৌশলের নিপুণতা।

একাধিক আলঙ্কারিক রীতিবাদের দোষ দেখিয়ে বলেছেন, নির্দোষ অবয়বে ভূষণ যোগ করলেই সৌন্দর্য আসে না। শরীরেও নয়, কাব্যেও নয়। ঈশ্বরগুপ্ত তাঁর কবিতায় একাধিক পরিচিত শব্দ বসিয়ে কাব্যসৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা কাব্য হয়ে ওঠেনি। আসলে রীতি কাব্যের আত্মা,-একথা ধ্বনিবাদীরা মেনে নিতে পারেন নি। কারণ, অবয়বসংস্থান নিখুঁত হলেই নারীদেহ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে না, অতে অলঙ্করণ থাক, আর নাই থাক। নারীদেহকে আকর্ষণীয় করে তোলে লাবণ্য। সেটি অবয়ব সহস্থানের অতিরিক্ত জিনিস। ঠিক তেমনি কবিদেরও কাব্যে এমন কিছু থাকে যা কিনা শব্দ, অর্থ, রচনাভঙ্গির অতিরিক্ত – তাকে বলা যায় কাব্যের আত্মা। মহাকবিদের বাণীতে এমন এক অতিরিক্ত বস্তু আছে বলে প্রতীয়মান হয়। যা রীতিসিদ্ধ, প্রসিদ্ধ অবয়বের থেকে আলাদা। তাই রীতি বা অবয়ব সংস্থান কাব্যের আত্মা নয়, কাব্যের আত্মা হল কাব্যের দেহাতিরিক্ত বস্তু, যাকে বলে ব্যঞ্জনা বা ধ্বনি।

## ৩। অনুভাব ও বিভাবের পার্থক্য

বিভাব হল কারণ এবং অনুভাব হল কার্য। বিভাবের দ্বারা রসের উদ্‌গম হয় এবং অনুভাবের দ্বারা ভাবের ক্রিয়া প্রকাশ পায়। যেমন, শোক। এই বিভাবে অনুভাব হল অশ্রু, ক্রন্দন ও মূর্চ্ছা।

আচার্য ভরত রতি– এই বিভাবের আটটি অনুভাবে উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল স্তম্ভন, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বিবর্ণতা, অশ্রু এবং মূর্ছা। আচার্য ভরত বলেছেন যে, বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীভাবের সংযোগে রসনিষ্পত্তি হয়। প্রশ্ন হল, কার সঙ্গে এদের সংযোগ ঘটে ? অবশ্যই স্থায়ীভাবের সঙ্গে।

বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থে বলেছেন, সহৃদয় সামাজিকের রতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাব, বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারীভাবের দ্বারা ব্যক্ত হয়ে রসরূপ লাভ করে। লৌকিক জগতের ভাব এবং সেই ভাব পাঠক ও দর্শক মনে জাগ্রত করার কারণ ও কার্যকে একজন কবি শব্দ ও অর্থে সমর্পিত করে কাব্যে নিয়ে আসেন। এই পদ্ধতিকে বলে 'সাধারণীকরণ'। তখন লৌকিকভাব অলৌকিক রসে পরিণত হয়।

যেমন–

রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারও কথা।।
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ান তারা।

– চণ্ডীদাসের এই পদে রাধিকা হলেন আলম্বন বিভাব। উদ্দীপন বিভাব হল বিরল স্থান, কালো মেঘ, কালো চুল প্রভৃতি। অনুভাব হল বিরল স্থানে বসে থাকা, কালো মেঘের দিকে চেয়ে থাকা, রাঙা বাস পরিধান করা প্রভৃতি। ব্যভিচারী ভাব হল চিন্তা, আবেগ ও স্মৃতি। স্থায়ী ভাব হল রতি। যেহেতু এখানে পূর্বরাগময়ী রাধার চিত্ত অঙ্কিত হয়েছে। তাই এখানে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার রস সৃষ্টি হয়েছে।

## ৪। 'কাব্যং গ্রাহ্যং অলঙ্কারাৎ'

কাব্য কি ? কাব্যের সংজ্ঞাই বা কি ? কাব্যের আত্মা কি ? – এ বিষয়ে নানা প্রশ্ন প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের আলোড়িত করেছিল। দেহাত্মবাদী আলঙ্কারিকেরা কাব্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন– 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম'।

– অর্থাৎ, শব্দ ও অর্থের সমন্বিত রূপই হল কাব্য। তাই এই শব্দ ও অর্থকে আটপৌরে না রেখে যদি সাজসজ্জায় সাজিয়ে দেওয়া যায়, তবে কাব্যের যে রূপটি গড়ে ওঠে তা সহজেই মনোহরণ করতে সমর্থ হয়। এই সাজসজ্জাকেই বলা হয় অলঙ্কার। কুণ্ডল, কণ্ঠহার, কেশবিন্যাস– এ সমস্তই হল অলঙ্কার। কাব্যালঙ্কারও ঠিক তাই।

কাব্যের আত্মার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়ে দেহাত্মবাদী আলঙ্কারিকেরা কাব্যের আলোচনায় অলঙ্কারকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। সেইজন্য একদা সংস্কৃত কাব্যবিচার শাস্ত্রকে অলঙ্কার 'শাস্ত্র' বলে অভিহিত করা হয়েছিল। অলঙ্কার বলতে এঁরা মূলতঃ অনুপ্রাসাদি শব্দালঙ্কার এবং উপমা, রূপক, সমাষোক্তি উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলঙ্কারকেই বুঝিয়েছেন। কাব্যে এই সমস্ত অলঙ্কারের গুরুত্বকে স্বীকার করে নিয়ে আলঙ্কারিক বামনাচার্য বলেছেন— 'কাব্যম্ গ্রাহ্যম্ অলঙ্কারাৎ'

আচার্য ভামহ বললেন, কান্তি থাকলেও নির্ভূষণ রমণীর মুখমণ্ডল সুন্দর বলে মনে হবে না। এখানে ভূষণ হল অলঙ্কার এবং কান্তি হল সহজাত সৌন্দর্য। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে কান্তি যদি সহজাত হয়, তাহলে বাহ্য অলঙ্কার সেই কান্তিকে সুপরিস্ফুট হতে সাহায্য করে। আর কান্তি যদি না থাকে, তাহলে অলঙ্কার কাকে পরিস্ফুট করবে ? তাই কাব্যবিচারে কান্তির দিকটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

অলঙ্কারবাদী এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, অলঙ্কারকে তার কাব্যের সৌন্দর্য বিধায়ক উপাদান রূপেই গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু বামনাচার্য আরও একটু অগ্রসর হয়ে অলঙ্কারকে কেবল সৌন্দর্য বিধায়ক রূপে নয়, সৌন্দর্যরূপেই দেখতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন–'সৌন্দর্যম লঙ্কারঃ' অর্থাৎ, বামন এখানে অলঙ্কার শব্দের অর্থ করেছেন সৌন্দর্য। আর এই সৌন্দর্যের জন্যই কাব্য পাঠকের কাছে গ্রহণীয় হয়। সৌন্দর্য পাঠকের নির্মল মনে আনন্দ ও রসের উদ্রেক ঘটায়– "A thing of beauty is joy of

ever." এই দৃষ্টি থেকে মহিম ভট্ট ও অলঙ্কারকে বলেছিলেন– "চারুত্বমলঙ্কারঃ"

আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি আলঙ্কারিকেরাও মনে করেছেন, সমগ্র চারুত্ব সম্পাদনের মধ্যেই রয়েছে কাব্যের অলঙ্কারের চূড়ান্ত সাফল্য। আনন্দবর্ধন তাঁর 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থে কাব্যে অলঙ্কার কীভাবে ব্যবহৃত হবে তা নির্দেশ করতে গিয়ে জানিয়েছেন—

১) অলঙ্কার ব্যবহৃত হবে রসের ব্যঞ্জনা সৃষ্টির জন্য,
২) কবির রসসৃষ্টির প্রয়াসের সঙ্গেই হবে এর জন্ম,
৩) স্বাভাবিক ও সহজভাবে তা বোধগম্য হবে,
৪) কবি অলঙ্কার সৃষ্টির জন্য পৃথক প্রচেষ্টা করবেন না,
৫) অলঙ্কার হবে কাব্যের অঙ্গীভূত,
৬) কখনো অলঙ্কার কাব্যে প্রধান হয়ে উঠবে না,
৭) মূল বক্তব্য বা বিষয় অনুযায়ী গৃহীত বা বর্জিত হবে না,
৮) অতিরিক্ত ও ব্যাপক হবে না।

এইভাবে কাব্যে অলঙ্কার যদি ব্যবহৃত হয় তবে তা প্রকৃতই কাব্যের চারুত্ব সম্পাদনের উল্লেখযোগ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে।

কিন্তু বিরুদ্ধবাদী আলঙ্কারিকদের মতে অলঙ্কার কাব্যের একটি বিশিষ্ট সৌন্দর্যবর্ধক উপাদান হলেও তা কখনো কাব্যের আত্মারূপে বিবেচিত হতে পারে না। তারা দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন যে, অলঙ্কার নেই অথচ কাব্য হয়েছে– এমন ঘটনা যেমন কাব্যজগতে বিরল নয় তেমনি আবার অলঙ্কার থাকা সত্ত্বেও কাব্য হয়নি এরকম ঘটনাও দুর্লভ নয়। বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থে কালিদাসের কুমারসম্ভব থেকে একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।–

"মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈক পাত্রে পপৌপ্রিয়াং স্বামনু বর্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শ নিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ।।"

রবীন্দ্রনাথ এর অনুবাদ করেছেন এইভাবে–

"একই কুসুমপাত্রে ভ্রমরপ্রিয়ার
পীত অবশেষ মধু করিলগো পান।
স্পর্শ নিমীলতা চক্ষু মৃগীর শরীরে
কৃষ্ণসার শৃঙ্গ দিয়া করিল আদর।"

কালিদাসের এই ছত্রদুটিতে কোনো অলঙ্কার নেই, তবুও একে অকাব্য বলা যাবে না। অকাল বসন্তের উদ্দীপনায় যৌবন রাগে রক্তবনস্থলীতে রতি দ্বিতীয় মদনের সমাগমে তির্যক্ প্রাণীদের অনুরাগের লীলাটিমাত্র কালিদাস ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তাকে কোন অলঙ্কারে সাজাননি। অথচ এর আবেদন পাঠকের কাছে কিছুমাত্র কম নয়।

অন্যদিকে অলঙ্কার আছে, অথচ কাব্যত্ব নেই তার দৃষ্টান্ত হিসেবে 'সাহিত্যদর্পণ'-এর একজন টীকাকারের এই ছত্রদুটি গ্রহণ করা যেতে পারে–

"তরঙ্গ নিকরোন্নীত তরুনীগণ সংকুলা।
সরিদ্বহতি কল্লোলব্যূহব্যাহততীরভূঃ।।"

এর অর্থ– "তরুনীগণ স্নান করতে নেমেছেন নদীতে নদীর তরঙ্গ প্রবাহ সেই স্নানার্থী তরুণীদের এনে ফেলেছে এমন তটভূমিতে যার কল্লোল বেষ্টনে তটভূমি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।"

এখানে ত, ন, ণ, ল, ব প্রভৃতির অনুপ্রাস, অলঙ্কার, আবার কল্লোল রূপ ব্যূহ অংশে আছে রূপক অলঙ্কার তবুও এই ছত্রদুটিকে যথার্থ কাব্য বলে কেউ গ্রহণ করবেন না।

সুতরাং, কাব্যের কাব্যত্ব অলঙ্কারের বর্তমানতা বা অবর্তমানতার ওপর নির্ভর করে না, তাই অলঙ্কারই কাব্যের শেষ কথা নয়। অলঙ্কার কাব্যের সৌন্দর্যবৃদ্ধি করে আবার তা কাব্যের হানি ঘটায়। ফলে সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্র বিচার পদ্ধতি অলঙ্কার ব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করে রসবাদের পক্ষে অগ্রসর হয়ে গেছে। সেখানে অলঙ্কারের অতিরিক্ত এবং বাচ্যাতিরিক্ত বস্তুই কাব্যের আত্মা বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। তাই শ্রেষ্ঠ কাব্যের প্রকৃতি অলঙ্কার নয় শ্রেষ্ঠ কাব্যের প্রকৃতি হচ্ছে বাচ্যকে ছাড়িয়ে যাওয়া। এই বাচ্যাতিরিক্ত ধর্মান্তরের অভিব্যঞ্জনার নাম ধ্বনি। এই ধ্বনি হচ্ছে কাব্যের আত্মা, অলঙ্কার সেখানে শব্দ ও অর্থের চারুত্ব সম্পাদন করে মাত্র।

## ৫। রসের উপাদান

"বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্"– এটাই হল ভারতীয় আলঙ্কারিকদের চরম মীমাংসা। এই রস কি ? রসের উপাদান বা কি ? কিভাবে রসনিষ্পত্তি হয় ? এই সকল প্রশ্ন নিয়ে আলঙ্কারিকদের মধ্যে তর্কবিতর্কের শেষ নেই। আমরা সেই রসের স্বরূপ, রসের উপাদান ও রসনিষ্পত্তি নিয়ে আলোচনা করব।

**রসের স্বরূপ :** রস কি ? ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরলে বলতে হয় রস একপ্রকার আস্বাদন। যা আস্বাদ্য তা-ই 'রস'। বস্তুগত অর্থ করলে রস-এর মানে হয় নির্যাস। যেমন– মধুর, অম্ল, তিক্ত ইত্যাদি। সাহিত্যের 'রস' বলতে সাহিত্যের নির্যাসকেই বোঝায়। কিন্তু নির্যাস তো স্বাদনীয়। এই স্বাদ-ই 'রস'। সাহিত্যের 'রস' মানে সাহিত্যের 'স্বাদ'।

কিন্তু এই স্বাদ ঠিক বস্তুজগতের মধুর, অম্ল ও কটু রসের স্বাদ নয়। বস্তুর স্বাদগ্রহণ করা হয় একটি বাহ্য ইন্দ্রিয় দিয়ে এবং তা হল রসনেন্দ্রিয়। সাহিত্যের স্বাদ আস্বাদিত হয় অন্তরিন্দ্রিয় দিয়ে, সহৃদয় সামাজিকের চিত্ত সাহিত্য রসের আস্বাদক। আর সাহিত্য রসের স্বাদটি স্থূল স্বাদও নয়, এ হল 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ', এ হল পরমাত্মার আস্বাদ তুল্য। সুতরাং, এ হল অলৌকিক। রসাস্বাদ জনিত আনন্দও লোকাত্তর। এইসব বিচার করে অভিনব গুপ্ত রসের এই সংজ্ঞাটি নির্দেশ করেছেন।

"স্বসংবিদানন্দ চর্বণ ব্যাপার রসনীয়– রূপরসঃ" (লোচন টীকা, ১/৪)

ফলে, রস হল নিজের আনন্দময় সম্বিতের (চেতনার) আস্বাদ রূপ ব্যাপার। সহৃদয় ব্যক্তির চিত্তে এটি রসমান (আস্বাদ্যমান) হয় বলে এর নাম রস। এ হল একপ্রকার লোকোত্তর আনন্দঘন প্রতীতি।

**রসের উপাদান :** রস আস্বাদ্যমান কয়েকটি প্রধান উপাদানের সংযোগে এই আস্বাদন সম্ভব হয়। স্থায়ীভাব, বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীভাব–এগুলি হল রসের উপাদান।

**i) স্থায়ীভাব :**

মানুষের হৃদয়ে অসংখ্য 'ভাব' আছে। কখনো মানুষের হৃদয় প্রেমভাবে পূর্ণ হয়, কখনো হাসিতে উদ্বেল হয়, কখনো শোকে অধীর হয়, কখনো ক্রোধে অশান্ত হয়, কখনো বা উৎসাহে উদ্দীপিত হয়। এমনি করে কখনো হৃদয়ে ভয় জাগে, কখনো জাগে ঘৃণা, কখনো বিস্ময় কখনো বা শমভাব। আরো অনেক ভাব আছে, যেমন– চিন্তা, মোহ, হর্ষ, আবেগ ইত্যাদি। যুগের অগ্রগতির সঙ্গে নতুন নতুন ভাবেরও উদ্ভব হয়, আবার একযুগের ভাব অন্য যুগে লুপ্ত হয়ে যায়। হৃদয়-সমুদ্রে ভাব যেন সংখ্যাহীন ঊর্মি– তা গণনা করে কার সাধ্য। মানুষ এই ভাবেরই প্রতিমূর্তি। পূর্ব পূর্ব যুগের অসংখ্য সংস্কার বা ভাব মানুষের চিত্তে বাসনা রূপে অবস্থান করে।

এই অসংখ্যকোটি ভাবের মধ্যে কতকগুলি আবার চিরন্তন। তারা অক্ষয়, অব্যয়। তাদের উদয় নেই, ব্যয় নেই। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই চিরন্তন সংস্কার রূপে এগুলি বর্তমান থাকে। পণ্ডিতেরা এই উদয় বিলয়বিহীন শাশ্বত ভাবগুলিকে বলেন স্থায়ীভাব। বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর সাহিত্য দর্পনে বলেছেন—

"অবিরুদ্ধা বিরুদ্ধা বা যং তিরোধাতুমক্ষমাঃ।
আস্বাদাঙ্কুরকন্দোহসৌ ভাবঃ স্থায়ীতি সম্মতঃ।।"

– অর্থাৎ, অবিরুদ্ধ বা বিরুদ্ধ অন্যকোন ভাব যাকে আচ্ছাদন করতে পারে না, যা রসাস্বাদ অঙ্কুরের মূল, তাই-ই স্থায়ীভাব বলে অভিহিত।

প্রকৃতপক্ষে, স্থায়ীভাবই হল ভাবগুলির সম্রাট, এরাই হল ভাবগুলির গুরু। অসংখ্য চিত্তবৃত্তির মধ্যে এদের বিশিষ্ট রূপ সহজে উপলব্ধি করা যায়। এই স্থায়ীভাবগুলি রস রূপে আস্বাদিত হয়। অসংখ্য চিত্তবৃত্তির মধ্যে স্থায়ীভাব মাত্র নয়টি (৯) —

১। রতি (মনের অনুকূল প্রেমার্দ্র ভাব),
২। হাস (বিকৃত ভাব হেতু মনের স্ফূরণ),
৩। শোক (প্রিয়-নাল হেতু মনের বিকলতা / বৈক্লব্য),
৪। ক্রোধ (প্রতিকূল বিষয়ে উগ্রতার ভাব),
৫। উৎসাহ (কর্তব্য সম্পাদনে উদ্যম),
৬। ভয় (ভীতির ভাব),
৭। জুগুপ্সা (ঘৃণার ভাব),
৮। বিস্ময় (অলৌকিক বিষয়ে চিত্তের বিস্ফারিত ভাব),
৯। শম (বিষয় পরাঙ্মুখতাহেতু আত্মায় মনের বিশ্রামজনিত সুখ)।

এই স্থায়ীভাবগুলি যথোপযুক্ত বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারীভাবের সংযোগে আস্বাদ্যমান রসে পরিণত হয়। এক-একটি স্থায়ী ভাব এক-একটি রসে রূপান্তরিত হয়। যেগুলি হল–

(১) রতিভাব > শৃঙ্গার রস, (২) হাস > হাস্য, (৩) শোক > করুণ, (৪) ক্রোধ > রৌদ্র,
(৫) উৎসাহ > বীর, (৬) ভয় > ভয়ানয়, (৭) জুগুপ্সা > বীভৎস, (৮) বিস্ময় > বীভৎস,
(৯) শম > শান্ত।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, রসের মূল উপাদান স্থায়ীভাব স্থায়ীভাবই রসে অভিব্যক্ত হয়।

**ii) বিভাব :** আমরা বাহ্য ইন্দ্রিয়বৃত্তিদ্বারা বহির্বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে অনুভব করি। বাইরের বস্তুর সান্নিধ্যে মনোভাব জাগ্রত হয়। একটি ফুল দেখলে আমাদের মনে আনন্দ হয়, একটি সাপ দেখলে ভয়ে ভীত হই, কারো দুঃখ দেখলে মনে শোকভাব জাগে। অন্তরের ভাব উদ্বোধনের কারণ এই বহির্বিশ্বের কোন না কোন পদার্থ। লৌকিক জগতে যা রতি-হাস-শোক প্রভৃতির ভাব উদ্বোধনের

কারণ, কাব্যসাহিত্যে নিবেশিত হলে তার নাম হয় বিভাব। বিশ্বনাথ কবিরাজ 'সাহিত্যদর্পন'-এ বলেছেন—

"রত্যাদ্যুদ্বোধোদকাঃ লোকে বিভাবাকাব্যনাট্যয়োঃ"

মনে রাখতে হবে, লৌকিক জগতের অনুভূতির কারণ স্থূলবাহ্যইন্দ্রিয় গ্রাহ্য। তা কাব্যের বিষয় নয়। কাব্যের জগৎ অলৌকিক আস্বাদের জগৎ। এইজন্য এদের অনুভূতি স্বতন্ত্র, নামগুলিও আলাদা। লৌকিক জগতের 'কারণ' হয়ে ওঠে কাব্যজগতের 'বিভাব'। এই বিভাব দুই প্রকার–

**ক) আলম্বন বিভাব –**

মুখ্যভাবে যে বিষয়টিকে অবলম্বন করে রসের উদ্গম হয়, তাকে বলে আলম্বন বিভাব, শৃঙ্গার রস বিষয়ে নায়ক-নায়িকার হৃদয়ে যে রসের প্রথম অঙ্কুর দেখা দেয়, তাকে নায়িকা বা নায়ক পরস্পরের আলম্বন বিভাব। যেমন—

"আজু মঝু শুভ দিন ভেলা।
কামিনী পেখনু সিনানক বেলা।।" – বিদ্যাপতি।

**শ্রীকৃষ্ণের উক্তি –**

কামিনী রাধার রূপদর্শনে তাঁর হৃদয়ে শৃঙ্গার রসের প্রথম অঙ্কুর দেখা দিয়েছে। এখানে কামিনী অর্থাৎ, রাধা হলেন আলম্বন বিভাব।

**খ) উদ্দীপন বিভাব –**

যে সকল বস্তু রসকে উদ্দীপিত করে, তা-ই উদ্দীপন বিভাব। উদ্দীপন বিভাব রসের অঙ্কুর উদ্‌গমের মুখ্য কারণ নয়, আলম্বন বিভা-ই মুখ্য। আলম্বনে যে রসের অঙ্কুর উদ্গত হয়, উদ্দীপন তাকে স্ফুটতর করে। যেমন—

"এ সখী হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।।– (বিদ্যাপতি)।

এখানে উদ্দীপন বিভাব 'ভরা বাদর' ও 'মাহ ভাদর'। এরাই রাধিকার বিরহ রতিকে উদ্দীপিত করেছে। আলম্বন বিভাব কৃষ্ণ অনুপস্থিত।

**iii) অনুভাব :**

হৃদয়ে কোন ভাবের উদয় হলে বাইরে তার প্রকাশ হয়। শোক উপস্থিত হলে চোখে অশ্রু দেখা দেয়। ক্রোধভাব জাগ্রত হলে চক্ষু আরক্ত হয়ে ওঠে। এই যে ভাব বিকারের বহিঃপ্রকাশ, কাব্যে নিবেশিত হলে তাকে বলা হয় অনুভাব। বিভাব হল ভাব উদ্গমের কারণ এবং অনুভাব হল সেই কারণের ক্রিয়া। 'সাহিত্য দর্পনে' বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন—

উদ্বুদ্ধং কারণৈঃ স্বৈঃ স্বৈর্বহির্ভাবং প্রকাশয়ন্।
লোকে যঃ কার্য্যরূপঃ সোহনুভাবঃ কাব্যনাট্যয়োঃ।।(৩/১৪০)

লৌকিক জগতের ভাবের বহিঃপ্রকাশ (কার্য) কাব্যজগতে অনুভাব বলে কথিত হয়। যেমন–

"হস্ত প্রসারণ করিয়া জ্ঞানানন্দ কহিলেন, 'এ বাহুতে কি বল নাই ?' বক্ষে করাঘাত করিয়া কহিলেন, 'এ হৃদয়ে কি সাহস নাই ?'" – বঙ্কিমচন্দ্র

– 'হস্ত প্রসারণ' ও 'বক্ষে করাঘাত' প্রভৃতি–কার্যগুলি এখানে উৎসাহভাব প্রকাশ অনুভাব।

**iv) সঞ্চারীভাব / ব্যভিচারীভাব :**

মানুষ ভাবেরই প্রতিমূর্তি। মনুষ্য হৃদয়ে যে কত অসংখ্য কোটি ভাব আছে, তার শেষ নেই। এই ভাবগুলির মধ্যে যে ভাবগুলি ভাবস্থির, চিরন্তন– আলঙ্কারিকগণ তাদের বলেছেন স্থায়ীভাব এবং অন্যান্যভাবগুলি ব্যভিচারী ভাব।

অর্থাৎ, যে ভাব স্থায়ীর অভিমুখে সঞ্চরণ করে, স্থায়ীভাবের মধ্যেই যার উদয় ও বিলয় তাকেই বলে ব্যভিচারী ভাব।

প্রকৃতপক্ষে স্থায়ীভাবগুলি হল– মুখ্য চিত্তবৃত্তি। তারাই রসে রূপান্তরিত হয়। আর ব্যভিচারীভাবগুলি স্থায়ীভাবকে পরিপুষ্ট করে মাত্র। ব্যভিচারীভাবের সংখ্যা ৩৩। যেমন– আবেগ, শ্রম, উগ্রতা, স্বপ্ন, লজ্জা, হর্ষ, বিষাদ, গ্লানি, চিন্তা প্রভৃতি। এই সঞ্চারীভাবগুলি স্থায়ী ভাবের মুখাপেক্ষী থেকে এবং তাদের সহকারী হয়ে রসনিষ্পত্তি করে থাকে। এই দুটি ভাব পরস্পর পরস্পরের উপকারী।

কিন্তু রসনিষ্পত্তিতে ব্যভিচারী যে স্থায়ীর অধীন– এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিভাব-অনুভব যেখানে রসাভিব্যক্তির বাহ্য উপাদান, সেখানে ব্যভিচারী তার আন্তরউপাদান। স্থায়ীর অধীন ও সহকারী হয়ে ব্যভিচারী আন্তর উপাদান। স্থায়ীর অধীন ও সহকারী হয়ে ব্যভিচারী সেখানে অশেষ বৈচিত্র্য সম্পাদন করে এবং সর্বদা রসের পুষ্টিসাধক হয়ে বিরাজ করে। যেমন—

"ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিঃশ্বাস সঘন

কদম্ব কাননে চায়।" – চণ্ডীদাস

– এখানে মূল স্থায়ীভাব রাধিকার পূর্বরাগমূলক রতি। রসপরিণাম হয়েছে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার। 'চপলতা', 'ঔৎসুক্য', 'আবেগ'– এই ব্যভিচারী ভাবগুলি স্থায়ীরতিকে বৈচিত্র্য দান করেছে। রসনিষ্পত্তিতে এখানেই ব্যভিচারীভাবের উপযোগিতা।

## ৬। "রস ও কাব্যের জগৎ অলৌকিক মায়ার জগৎ"

কাব্যের আত্মা কি– এই অমীমাংসীত বিতর্কটির সমাপ্তি ঘটেছে রসধ্বনিতে। সহৃদয় লোকের অর্থাৎ কাব্যানুশীলনের অভ্যাসবশে যাঁদের দর্পণের মত নির্মল মন এমন দরদী লোকের সুকাব্যজনিত চিত্তের অনুভূতি বিশেষের নামই রস। এই রস 'সহৃদয় হৃদয়সংবাদী'। রসের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন, রস হল এমন একটা অনুভূতি যা নিকটকে দূর করে দেয়, আবার যা সর্বসাধারণের তাকে নিজের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা রূপান্তরিত করে, যা ক্ষণের মধ্যে অনন্তের আস্বাদ দেয়, যার একান্ত ব্যক্তিগত, অথচ একেবারে ব্যক্তি-স্বভাব বর্জিত। ভাব ও রসের, বস্তুজগৎ ও কাব্যজগৎ-এর ভেদকে প্রকাশের জন্যে আলংকারিকেরা বলেছেন—"রস ও কাব্যের জগৎ অলৌকিক মায়ার জগৎ।"

সাধারণতঃ অলৌকিক বলতে আমরা বুঝি, এমন কিছু যা মানুষের দ্বারা সৃষ্ট নয়। রস মানুষের দ্বারা সৃষ্ট। তবুও রসকে বলা হয়েছে অলৌকিক। তার কারণ, লৌকিক জীবনের উপলব্ধি থেকে রস পৃথক। ভাব ও রস সম্পূর্ণ পৃথক। পার্থক্যটি এইরকম–

ভাব + বস্তুজগৎ = লৌকিক

রস + কাব্যজগৎ = অলৌকিক।

লৌকিক জীবনে যা কুৎসিত ও বীভৎস, দুঃখজনক তা যখন রসোত্তীর্ণ হয়, তখন তা আর দুঃখজনক থাকে না। সেটি হয়ে ওঠে অলৌকিক আনন্দের জগৎ। তাই তা চোখে জল আনলেও মনকে অপূর্ব আনন্দে পূর্ণ করে।

মানুষের মনে যে ইমোশন বা ভাব রয়েছে, তা লৌকিক। লৌকিক জগতের সঙ্গে তাদের লৌকিক সম্পর্ক। যেমন, বাল্মীকির মনে যে শোক ভাবটি ছিল, তা একান্তভাবে লৌকিক। কিন্তু সেই লৌকিক ভাবটি যখন শ্লোকে রূপান্তরিত হল, তখন তা হলে উঠল অলৌকিক। কারণ, রস মনে যে অপূর্ব আনন্দের সৃষ্টি করে তার একমাত্র প্রমাণ হৃদয়বান লোকের নিজের চিত্তের অনুভূতি। করুণরস অলৌকিক। তা মনে আনন্দের সৃষ্টি করে। তাই 'Our sweetest songs are those that tell of saddest thought'– যে বাস্তব ঘটনা মনে সরাসরি Sad thought আনে তা Sweet ও নয় আর Song ও নয়। কিন্তু কবি যখন Saddest thought-এর কথা বলেন তখন তা হয়ে ওঠে Sweetest song.

রস ও কাব্যের জগৎ অলৌকিক মায়ার জগৎ। আমাদের লৌকিক জগতে শোক, আনন্দ, বিস্ময় প্রভৃতি ভাব মনে দুঃখ ও সুখের সৃষ্টি ওঠে। এর কারণ হল– 'All high poetry is infinite'। প্রসঙ্গত বলা চলে, দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দদায়ক। এর কারণ, দুঃখের তীব্র অভিঘাতে আমরা আমাদেরকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করি। যা চৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করে তা আনন্দদায়ক। সাহিত্যদর্পণে বলা হয়েছে–

অলৌকিকবিভাবত্বং
প্রাপ্তেভ্যঃ কাব্যসংশ্রয়াৎ।
সুখং সঞ্জায়তে তেভ্যঃ
সর্বেভ্যোহপীতি কা ক্ষতিঃ। (৩/৬)

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, লৌকিক জীবনেও অনেক দুঃখজনক ব্যবহারেও আনন্দ পাই। তা না হলে পরনিন্দা এত মুখরোচক হত না এবং মহিষের মত প্রকাণ্ড জন্তুকে বলি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্তমাখা উন্মত্ত নৃত্য সম্ভবপর হত না। দুঃখের মধ্যে 'আমি আছি' অর্থাৎ এই অস্মিতাবোধই আনন্দের কারণ।

দুঃখের কাব্য আমাদের চিত্তে কেন আনন্দ দেয় এর যথার্থ উত্তর পাওয়া যাবে, যদি রসের অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে আমরা সচেতন থাকি। বাল্মীকি ক্রৌঞ্চমিথুন-এর দৃশ্য দেখে যদি কেবল দুঃখই পেতেন এবং শ্লোকের সৃষ্টি না করতেন তা হলে করুণ রসের সৃষ্টি হত না। তখন শ্লোকটি হত Personal। কিন্তু শ্লোক-সৃষ্টির ফলে সেটি হয়ে উঠেছে Impersonal ও অলৌকিক। অ্যারিস্টটল তাঁর Poetics গ্রন্থে বলেছেন যে, ট্র্যাজেডি আমাদের মনে ভয় ও অনুকম্পা (Pity & Fear) জাগ্রত করে। এই দুটি প্রবৃত্তি ক্যাথারসিস বা পরিশোধন সম্পাদন করে। ট্র্যাজেডিতে যে কাহিনী বর্ণিত হয়, যেভাবে চরিত্র সৃষ্টি করা হয়, যেসব ভাব প্রকাশিত হয় তা থেকে আমাদের হৃদয়ে নায়ক-নায়িকার জন্য ভয় ও অনুকম্পার সৃষ্টি হয়। তার কারণ, আমাদের মনে হয় যে, আমরা ঐ অবস্থায় পড়লে আমাদেরও ঐরূপ দশার সৃষ্টি হত। এইভাবে ভয় ও অনুকম্পার উদ্রেক হলে আমাদের চিত্ত সুদ্ধ-প্রশান্ত অবস্থা লাভ করে। এই ভীতি ও অনুকম্পা লৌকিকতায় আবদ্ধ না থেকে বিশ্বজনীনতায় রূপান্তরিত হয়।

রস ও কাব্যের জগৎ গভীর অনুভবের জগৎ। এইজন্যই তা আনন্দময়। এ বিষয়ে ভবভূতি বলেছেন–

> "যেমন বীজ থেকে বৃক্ষ হয়, বৃক্ষ থেকে পুষ্প হয় এবং ক্রমে ফল হয়, কাব্য বিষয়ে রসসমূহ মূল তা থেকে ভাবসমূহ ব্যবচ্ছিত হয়ে থাকে।"

তাই বুচার বলেছেন—

"Poetry is an immotional dilight, its end is to give pleasure"।

প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"এক হিসাবে সৌন্দর্য মাত্রই abstract . সে তো বস্তু নয়, সে একটা প্রেরণা, যা আমাদের অন্তরে রস সঞ্চার করে।"
(প্রভাত মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি, ৬ চৈত্র্য, ১৩০২)

সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ তার ক্ষণিক নিত্যতা, সুদূর নৈকট্য এবং সার্বভৌমিক ব্যক্তিত্ব। আলংকারিকগণ অলৌকিকত্বকে ভিত্তি করেই সাহিত্যের সংজ্ঞা দানে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তাই রস ও কাব্যের জগৎ সত্যিকারের অলৌকিক মায়ার জগৎ।

## ৭। রস কাব্যের আত্মা / রসের স্বরূপ

**রস :**

রস হল আনন্দময় সম্বিতের আস্বাদরূপ ব্যাপার। মনের পূর্ব নির্দিষ্ট রতি প্রভৃতির ভাবের বাসনার সাহায্যে রঞ্জিত হয়ে সম্বিৎ আনন্দিত সৌকুমার্য লাভ করে। লৌকিকভাবের কারণ ও কার্য কবির ব্যবহৃত শব্দে সমর্পিত হয়ে সমস্ত হৃদয়ে সমবাদী সুন্দর বিভাব, অনুভাব রূপ প্রাপ্ত হয় সেই বিভাব ও অনুভাব কাব্যানুরাগের অন্তর্নিহিত ভাবগুলিকে উদ্বুদ্ধ করে তখনই তা আস্বাদযোগ্য হয়ে ওঠে। একেই বলে রস। এই রসই হচ্ছে কাব্যের আত্মা। তাই ধ্বনিবাদী আলংকারিকেরা বলেছেন—

"কাব্যের আত্মা ধ্বনি বলে যারা আলোচনা শুরু করেছেন তারা শেষ করেছেন যে এই বলে, যে এই ধ্বনি রসের ধ্বনি অর্থাৎ রসাত্মক বাক্যই কাব্য।"

**রসের স্বরূপ :**

কবির অনুভূত লৌকিকভাব হৃদয়ে সিদ্ধি লাভ করে রসে পরিণত হয়। বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারী ভাবের দ্বারা রস নিষ্পত্তি হয়ে থাকে। যে কবির এই রস নিষ্পত্তি করার ক্ষমতা আছে তিনি পাঠকচিত্তের মধ্যেও লৌকিক ভাবকে অলৌকিক সিদ্ধিতে পরিণত করে দেন। প্রত্যেক প্রতিভাধর কবির সৃষ্টি কৌশলে গড়ে ওঠে কাব্য সৃষ্টির এক রহস্যময় জগৎ। গড়ে ওঠে রসের অনন্য আস্বাদন।

**রসতাত্ত্বিকদের ব্যাখ্যা :**

যে সব রসতাত্ত্বিক রসের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন তারা মোটামুটিভাবে দুভাগে ভাগ করেছেন যথা মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে ও আধ্যাত্মিক উপায়ে। তবে বিভিন্ন আলোচনা থেকে একটি সংজ্ঞা দেওয়া যায়,–

শব্দার্থজাত ভাবতন্ময় চিত্তে, আনন্দ স্বরূপে প্রকাশই হল রস।

এই সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যায় আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু বৃহৎ আকারে বলা যায় লৌকিক জগতের বস্তু কবি প্রতিভার সাহায্যে শব্দার্থে সমর্পিত হয়ে কাব্যজগতের অলৌকিক বিভাব ও অনুভাবে পরিণত হয় এবং সহৃদয় সামাজিক চিত্তের সঙ্গে তাদের তন্ময়ীভাবনের ফলে সামাজিক চিত্তের বাসনালোক থেকে অনুরূপ স্থায়ীভাব ও ব্যভিচারভাব উদ্বুদ্ধ করে। সাধারণীকরণের ফলে পরিমিত ভাব বিগলিত হলে পাঠকের চিত্তে রজঃ ও তমো গুন মুক্ত হয়ে সত্ত্বগুনে অধিষ্ঠিত হয় এবং তখন স্থায়ীভাবের ঐক্যতানের জন্য পাঠকের চিত্তে স্ব-স্বরূপচিদানন্দের যে প্রকাশ তাই হল রস।

**রস উপলব্ধির প্রক্রিয়া :** রসোপলব্ধির প্রক্রিয়াকে চারটি স্তরে আলোচনা করা যায়—

**প্রথমত ঃ** রসোপলব্ধির প্রক্রিয়ায় প্রথমত তিনটি জগৎ আছে। বাহ্যজগৎ, কাব্যজগৎ ও অন্তর্জগৎ।

ক) **বাহ্য জগৎ ঃ** বাহ্য জগতে যে সব বস্তু আছে সেই বস্তু বা তার অনুরূপ কিছু শব্দে সমর্পিত হলে তা কাব্য জগতের বিষয় হয়।

খ) কাব্য জগৎ ঃ লৌকিক জগতের কার্যকারণ কাব্যের জগতে রূপান্তরিত হলে তা কাব্যের অলৌকিক জগতে রূপলাভ করে। অলৌকিক জগতের কারণকে বলে বিভাব এবং কার্যকে বলে অনুভাব।

গ) অন্তর্জগৎ ঃ লৌকিক জগতের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে তাই জগতের নানা ঘটনা আমাদের চিত্তকে আলোড়িত করে। কবি প্রতিভার স্পর্শে সেইসব ঘটনা বাসনা দ্বারা ভাবলোক তৈরি করে এবং সেখানে রস উৎপন্ন হতে পারে। পাঠকের এই মনোভূমিকে বলে অন্তর্জগৎ।

দ্বিতীয়ত ঃ সাধারণীকরণ হল রস উৎপত্তির একটি প্রক্রিয়া। এই কথার অর্থ কাব্যের বিভাব ও অনুভাবের মধ্যে এমন এক অলৌকিক শক্তি থাকে যে কবি যে ভাব বা চরিত্র তাঁর কাব্যে চিত্রিত করেন তাদের সঙ্গে পাঠকের এক অভিন্ন সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কাব্য পাঠকের মধ্যে তখন মনে হয়, কাব্যে যে ভাব ও চরিত্র চিত্রিত হয়েছে তা পরের, কিন্তু সম্পূর্ণ পরের নয়; আমার নিজের, অথচ যেন সম্পূর্ণ নিজের নয়।—

'পরস্য ন পরস্যেতি
মমেতি ন মমেতি চ।
তদা স্বাদে বিভাবাদেঃ

পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে । ।'

এমনি করেই কাব্যের আস্বাদ কোনো ব্যক্তিত্বের পরিচ্ছেদে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে না।

**তৃতীয়তঃ** বাসনালোক রস উপলব্ধির একটি অনন্য প্রক্রিয়া। রসবাদী আলংকারিকদের মতে কাব্য পাঠকের হৃদয় কাব্যত্বের প্রধান প্রমান স্থল। কাব্য পাঠকের হৃদয়ে লৌকিকভাব রসে আপ্লুত হয়ে পড়ে। তখনই রচিত হয় সার্থক কাব্য। বাসনালোক হল পাঠকের অন্তরে কাব্যের ভাবকে রসে পরিণত করার প্রক্রিয়া। এ যেন পাঠকের ভাবের অনুভূতি আস্বাদনের আলোড়ন।

**চতুর্থতঃ** রস উপলব্ধির সর্বোচ্চ প্রক্রিয়াটি হল স্ব-স্বরূপচিদানন্দ। যে কোনো কাব্য পাঠকালে কাব্য রসিকের মনে কাব্যের চিত্রিত ভাব ও চরিত্রের সঙ্গে তন্ময় হয়ে যায়। এর ফলে কাব্য পাঠকের মনে ভাব জাগ্রত হয়। সেই ভাব যখন প্রবল হয় তখন কাব্যের বিভাব, অনুভাব প্রভৃতি ক্রমশ অগোচর হয়ে থাকে এবং হৃদয়ে ভাবময় একাকার বৃত্তি উঠতে থাকে। চিত্তবৃত্তির কোনো সময়ে নিরোধ হয় না। এই বৃত্তে অবিচ্ছিন্ন হয়ে একটি ভাবের প্রবাহের মতো চলে। এই ধরণের তন্ময়তাকে বলে চিত্তের স্থিরতা। প্রকৃত তন্ময়তা আসে রজঃ, এবং তমোঃ গুন মুক্ত হয়ে যে চিত্ত সত্ত্ব গুনে অধিষ্ঠিত, সেই চিত্তে। তখনই চিদানন্দ স্বরূপে আবরণ উন্মোচিত হয় এইরকম চিত্তে চিদানন্দ স্বরূপ আত্মার প্রতিবিম্ব পড়ে। ভাবময় স্থির চিত্তে এই আনন্দ স্বরূপের প্রকাশই হল রস।

## ৮। রসের উৎপত্তি সম্পর্কে চারটি মতবাদ

(১) **ভট্টলোল্লটের উৎপত্তিবাদ :** ভারতের নাট্যশাস্ত্রের বিখ্যাত রত সূত্রটি হল- "বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রস নিষ্পত্তিঃ'। সূত্রটির অর্থ হচ্ছে– 'বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে রসের নিষ্পত্তি হয়ে থাকে।' এই চমকপ্রদ রসসূত্র ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে কালক্রমে প্রচুর আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার মুখ্য কারণ তিনটি– এক, সূত্রটির মধ্যে ভরতমুনি বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের উল্লেখ করলেও স্থায়ী ভাবের উল্লেখ করেননি কেন ? দুই, 'সংযোগ' শব্দটি প্রয়োগ করে কী বোঝাতে চেয়েছেন তিনি ? তিন, ভরতমুনি-কথিত 'নিষ্পত্তি' কথার যথার্থ তাৎপর্য কি ? প্রাচীন ভারতীয় আচার্যগণ নিজ নিজ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা অনুযায়ী ভরতাচার্যের রসসূত্রের ব্যাখ্যান ও প্রশ্নগুলির সমাধানে অগ্রসর হয়েছেন। পূর্বমীমাংসা দর্শনের মতানুসারে রসসংক্রান্ত সমগ্র বিষয়টি পর্যালোচনা করেছেন পণ্ডিত ভট্টলোল্লট এবং নিজস্ব সিদ্ধান্ত 'উৎপত্তিবাদ' প্রচার করেছেন।

ভট্টলোল্লট প্রশ্ন তুলেছেন– রসের উৎপত্তিস্থল বা আশ্রয়স্থল কি ? যিনি কাব্য-নাটক লেখেন তিনি ? সহৃদয় সামাজিক ? যাঁরা বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন, সেই অনুকর্তা নটগণ ? না কি কাব্য-নাটকের যা বিভাব সেই অনুকার্য নায়ক-নায়িকা বা পাত্রপাত্রীগণ ? ভট্টলোল্লটের সুচিন্তিত মতানুসারে, রসের যথার্থ উৎপত্তিস্থল বা আশ্রয়স্থল হচ্ছে অনুকার্য পাত্রপাত্রীগণ। 'শকুন্তলা' নাটকের যে শৃঙ্গাররস তা বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের 'সংযোগে' উৎপন্ন হয় নাটকটির নায়ক-নায়িকা দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার হৃদয়ে। সেই শৃঙ্গাররস আগে তাঁদের হৃদয়ে ছিলো না, পরে বিভাবাদির সংযোগে শৃঙ্গাররসের উৎপত্তি বা আবির্ভাব তাঁদের হৃদয়ে ঘটে থাকে। এইভাবে অ-পূর্ব বস্তু রসের উৎপত্তির তত্ত্ব ভট্টলোল্লট প্রচার করেছেন। আর তাই তাঁর রসসিদ্ধান্তের নাম 'উৎপত্তিবাদ' বলে পরিচিত।

বিভাবাদির সংযোগে অনুকার্য পাত্রপাত্রীর (বা নায়ক-নায়িকার) হৃদয়ে রসোৎপত্তি হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, 'সংযোগ' কথাটির প্রয়োগের দ্বারা কোন্ অর্থ বোঝানো হচ্ছে ? লোল্লটাচার্য বলেছেন, 'সংযোগ' কথাটির অর্থ হচ্ছে 'সম্বন্ধ' – বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের সঙ্গে অনুকার্য পাত্রপাত্রীগণের রসাত্মক চিত্তবৃত্তির সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধ তিন প্রকারের হতে পারে– বিভাবের ক্ষেত্রে উৎপাদ্য-উৎপাদক সম্বন্ধ, অনুভাবের ক্ষেত্রে গম্য-গম্যক সম্বন্ধ, ব্যভিচারীর ক্ষেত্রে পোষ্য-পোষক সম্বন্ধ। এই যে তিন প্রকারের সম্বন্ধ তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বিভাবগত উৎপাদ্য-উৎপাদক সম্বন্ধ। সেই বিভাবগত উৎপাদ্য-উৎপাদক সম্বন্ধের জন্যই অনুকার্য দুষ্যন্ত-শকুন্তলার মধ্যে স্থায়ী ভাব রতি ও তজ্জনিত শৃঙ্গার-রসের উৎপত্তি হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বিভাব রসবীজের উৎপত্তির মূল কারণ।

২) **ভট্টশঙ্কুকের অনুমিতিবাদ :** ভট্টশঙ্কুর ভট্টলোল্লটের মতো অনুকার্য পাত্রপাত্রী (নায়ক-নায়িকা) ইত্যাদিকে রসের আশ্রয়স্থল বা উৎপত্তিস্থল রূপে প্রতিষ্ঠিত করেননি। তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন, সহৃদয় সামাজিকের চিত্তই হচ্ছে রসের উদ্ভবভূমি। ভট্টশঙ্কুর স্পষ্ট করেই বলেছেন– 'রসচর্বণা হচ্ছে সহৃদয় সামাজিকের ব্যাপার। চর্বণা চ সামাজিকানাম্।' তিনি এটাও মেনে নিয়েছিলেন যে, বাস্তব জগতের লৌকিক রস ও সাহিত্যের অলৌকিক রসের মধ্যে পার্থক্য আছে। সেদিক থেকে বিচার করলে মনে হয়, তাঁর বক্তব্যের মধ্যে আপত্তিকর কিছু নেই।

ভট্টশঙ্কুক আচার্য ভরতমুনির রসসূত্র বিশ্লেষণ ও বিচার করতে গিয়ে ভট্টলোল্লটের 'উৎপত্তিবাদ' প্রথমে খণ্ডন করেন। তাঁর মতে, 'সহৃদয় কর্তৃক স্থায়ী ভাবের অনুমানই রসানুভব।' এই উক্তির মধ্যে 'অনুমান' কথাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভট্টলোল্লটের 'উৎপত্তিবাদ' প্রসঙ্গে দেখা গেছে– অনুকার্য নায়ক-নায়িকা বা পাত্র-পাত্রী (অর্থাৎ বিভাব) থেকে রসের উৎপত্তি হয়। বিভাবের সঙ্গে পাত্র-পাত্রীর সম্বন্ধ হচ্ছে উৎপাদ্য-উৎপাদকের। কিন্তু ভট্টশঙ্কুকের মতে, বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারী ভাবের সঙ্গে স্থায়ী ভাবের সম্বন্ধ

হচ্ছে অনুমাপ্য-অনুমাপকের। স্থায়ী ভাব অনুমাপ্য, বিভাবাদি অনুমাপক। অনুমাপক বিভাবাদির সাহায্যে অনুমাপ্য স্থায়ী ভাব অনুমান করে নিতে হয়। বিভাবাদির সাহায্যে অনুমাপ্য স্থায়ী ভাব অনুমান করে নিতে হয়। বিভাবাদির সাহায্যে স্থায়ী ভাবের এই অনুমিতির (inference) তত্ত্বকেই ভট্টশঙ্কুক অনুমিতিবাদ বলেছেন।

বিভাবাদির সাহায্যে স্থায়ী ভাব কোথায় অনুমিত হয় ? অনুকর্তা নট-নটী না অনুকার্য নায়ক-নায়িকা বা পাত্র-পাত্রীর চিত্ত-কোথায় সেই স্থায়ী ভাব অনুমানের স্থল ? ভট্টশঙ্কুকের মতে, সহৃদয় সামাজিক অনুকর্তা নাট-নটীর মধ্যেই স্থায়ী ভাব অনুমান করে থাকে, অনুকার্য নায়ক-নায়িকা বা পাত্র-পাত্রীর মধ্যে নয়। তর্ক উঠেছে, অনুকর্তা নট-নটীর পক্ষে কখনও স্থায়ী ভাব তথা রসের আশ্রয় হওয়া সম্ভব নয়। কেননা, যতবড়ো শিল্পীই হোন না কেন, কোনো নট দুষ্যন্তের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নায়িকা শকুন্তলা সম্পর্কে রতি নামক স্থায়ী ভাব অনুভব করতে পারেন না। কোনো নটীর পক্ষেও (শকুন্তলার ভূমিকায় অভিনয়ের সময়) সেই একই কথা। এই ধরনের তর্কের উত্তরে শঙ্কুকের বক্তব্য এই যে, কোনো নট যখন দুষ্যন্তের ভূমিকায় অভিনয় করেন তখন তিনি আর সহৃদয় সামাজিকের লৌকিক জ্ঞানের বিষয় থাকেন না। তিনি তখন বাস্তব সত্যাসত্যের ঊর্ধ্বে বা লৌকিক জ্ঞানের বাইরে এক অলৌকিক জগতে উত্তীর্ণ হয়ে যান। আর সেই কারণেই সহৃদয় সামাজিক নটকে দুষ্যন্ত মনে করে তার মধ্যে স্থায়ী ভাব রতি অনুমান করে নেয়। নট বা নটীতে রতি প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি বা স্থায়ী ভাবের বাস্তব সত্তা না থাকলেও নট বা নটীর অভিনয়নৈপুণ্যের জন্যই সেটা ভেবে নেওয়া সম্ভব হয়। নট বা নটীর মধ্যে স্থায়ী ভাবের সেই অনুমান বা অনুমিতি অবাস্তব বা ভ্রান্ত হলেও সহৃদয়ের চিত্তে রসোদ্বাধনে কোনো ব্যাঘাত ঘটে না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভট্টশঙ্কুকের মতে অনুকর্তা নট-নটীর মধ্যে সহৃদয় সামাজিক স্থায়ী ভাব তথা রস অনুমান করে নেয়। বিভাবাদির 'সংযোগ' সেই অনুমানের হেতু-চিহ্ন। এই বিচার-বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, যেমন ভট্টলোল্লটের 'উৎপত্তিবাদে' তেমনি ভট্টশঙ্কুকের 'অনুমিতিবাদে' সহৃদয় সামাজিকের হৃদয়সংবাদের কোনো ভূমিকা নেই। তাঁরা উভয়েই মনে করেছেন, স্থায়ী ভাব ও রস অভিন্ন। তাছাড়া সহৃদয় সামাজিকের চিত্তবৃত্তির সঙ্গে সেই রসের কোনো সম্পর্ক আছে বলেও তাঁরা মনে করেননি।

৩) **ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদ :** আচার্য ভট্টনায়ক সাংখ্যদর্শনের মতানুসারে ভরতমুনির রসসূত্রের যে ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত প্রচার করেন তা অলংকারশাস্ত্রে ভুক্তিবাদ নামে পরিচিত। এই ভুক্তিবাদে কাব্য-সাহিত্যের তিনটি ব্যাপার বা শক্তি বা ক্রিয়ার (functions) কথা বলা হয়েছে– 'অভিধা', 'ভাবনা' ও 'ভোগীকৃতি'। সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে রসসঞ্চারের পক্ষে এই তিনটি ব্যাপারেরই ভূমিকা অনস্বীকার্য। তবে এদের মধ্যে 'ভোগীকৃতিই' যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, তাকে কোনো সন্দেহ নেই।

অভিধা হচ্ছে শব্দের মুখ্যশক্তি। সেই শক্তিবলে একটি শব্দ তার নির্দিষ্ট অর্থ বুঝিয়ে থাকে। ইংরেজীতে একে denotation বলে। কাব্য হচ্ছে বাক্যসমষ্টি আর বাক্য হচ্ছে শব্দসমষ্টি। সেই বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেকটি শব্দের অভিধাশক্তি যখন নিজ নিজ অর্থ বুঝিয়ে দেয় এবং সহৃদয় সামাজিক যখন সেই অর্থগুলির মধ্যে অন্বয় বা সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারে, একমাত্র তখনই বাক্যের তথা কাব্যের বাচ্যার্থবোধ জাগ্রত হয়। কিন্তু এই বাচ্যার্থবোধ জাগানোই কোনো কাব্যের প্রধান লক্ষ্য হতে পারে না। তার প্রধান লক্ষ্য নিঃসন্দেহে রসসৃষ্টি। কিন্তু কাব্যের অন্তর্গত বাক্যগুলির এবং প্রত্যেক বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলির অভিধা-শক্তির দ্বারা যে বাচ্যার্থবোধ বা অভিধেয়ার্থবোধ (literal sense) জন্মায় তা থেকে সরাসরি কাব্যগত অলৌকিক রসপ্রতীতির উদ্ভব হতে পারে না। সেইজন্য আলংকারিক ভট্টনায়ক কাব্যের বহিরঙ্গগত বাচ্যার্থবোধ ও অন্তরঙ্গগত রসপ্রতীতির মধ্যে আরেকটি ব্যাপারের কথা উল্লেখ করেছেন– তার নাম 'ভাবনা'। একথার অর্থ হচ্ছে এই যে, কবি-বিবৃত শব্দগুচ্ছের বাচ্যার্থগুলি সহৃদয় সামাজিকের পক্ষে একদিকে যেমন 'স্বগত', অন্যদিকে তেমনি 'পরগত' বলে মনে হয় না। তখন কাব্যবর্ণিত বিষয়গুলি বা বাচ্যার্থগুলি সামাজিকের চিত্তে স্বগত-পরগত-নির্বিশেষে বিরাজ করে। এই অদ্ভুত অবস্থাকেই অলংকারশাস্ত্রে বলে পরিমিতব্যক্তিত্ববোধের বিলোপ ও সকল সামাজিকের একঘনতা। সকল সমাজিকের ব্যক্তিত্বের প্রাচীর অবলুপ্ত করে সাধারণীকরণ বা universalisation সৃষ্টি করবার এই যে অসাধারণ ক্ষমতা তাকেই ভট্টনায়ক 'ভাবনা' নামে অভিহিত করেছেন। আসল কথা, 'অভিধা' যেমন কাব্যের শব্দশক্তি, তেমনি 'ভাবনা' হচ্ছে কাব্যের অর্থশক্তি। কবিকর্মের অন্তর্গত শব্দসম্ভার যখন অভিধাগত সীমায়িত শক্তিকে অতিক্রম করে কাব্যের বিভাবাদিকে সাধারণীভূত করার মতো বিশেষ অর্থশক্তি প্রকাশ করে তখনই 'ভাবনা'র ব্যাপার ঘটে।

'অভিধা' ও 'ভাবনার' মধ্য দিয়ে কাব্যবর্ণিত বাচ্যার্থ অর্থাৎ অলৌকিক বিভাবাদির সঙ্গে সহৃদয় সামাজিকের চিত্তের সাধারণীকরণের ফলেই রসাস্বাদ ঘটে, একথা ঠিক নয়। সহৃদয় সামাজিকের চিত্ত যখন সাধারণীকৃত পদার্থগুলির চর্বণায় বা আস্বাদ-গ্রহণে একান্তভাবে ব্যাপৃত, তখন সেই মনোগত বা অন্তমুখ প্রক্রিয়ায় ত্রিগুণাত্মক চিত্তের রজোগুণ ও তমোগুণ তিরোহিত হয়ে যায় এবং সত্ত্বগুণের নিরতিশয় উদ্রেক ও প্রাধান্য ঘটে। এই অবস্থায় চৈতন্যের মল বা আবরণ (nescience) দূরীভূত হয়ে তার (চৈতন্যের) অপরিমেয় আনন্দস্বরূপের আস্বাদনের সুযোগ ঘটে। সেই উচ্ছলিত আনন্দস্বরূপ বা চৈতন্যানন্দের আস্বাদনকেই ভট্টনায়ক ভোগীকরণ বা রসচর্বণা বলেছেন। এককথায়, ভট্টনায়কের মতে ভাবনা বা ভাবকত্ব-ব্যাপারের ফলে রস ভাবিত হয় আর তার আস্বাদ বা ভোগ হয় ভিন্ন একটি ব্যাপারের ফলে– তাকে বলে ভোজকত্বের ব্যাপার বা ভোগীকরণের ব্যাপার। ভট্টানায়ক যোগীদের ব্রহ্মস্বাদের সঙ্গে তুলনা করে সেই কাব্যগত ভোগীকরণ বা রসচর্বণাকে 'ব্রহ্মস্বাদের সঙ্গে তুলনা করে সেই কাব্যগত ভোগীকরণ বা রসচর্বণাকে 'ব্রহ্মস্বাদসহোদর' বলেছেন।

আচার্য ভট্টনায়ক এই 'ভুক্তিবাদে' কাব্যমীমাংসাশাস্ত্রের অনেক প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁর আলোচনায় অনেক সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসার প্রয়াস আছে। সেই দিক্ থেকে বিচার করতে গেলে তাঁর 'ভুক্তিবাদ' যে ভট্টলোল্লটের উৎপত্তিবাদ ও শঙ্কুর অনুমিতিবাদের চেয়ে উন্নততর মতবাদ, তাকে কোনো সন্দেহ নেই।

৪) **অভিনব গুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ :** অভিনব গুপ্ত রসতত্ত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার। তিনি পূর্বসরীদের সিদ্ধান্ত বা মতবাদের পর্যালোচনা করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজের মতবাদকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন।

ধ্বনিবাদ অনুসারে শব্দের তিনটি শক্তি আছে– অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা (ধ্বনি)। কাব্যের শব্দার্থ এই তিনটি শক্তির সাহায্যে কোনো বস্তু বা অলংকার বা রস ব্যঞ্জিত করে। আচার্য অভিনবগুপ্ত বলেছেন, 'রসই বস্তুতঃ আত্মা, বস্তু (-ধ্বনি) ও অলংকার (-ধ্বনি) সর্বপ্রকারে রসেই পর্যবসান হয়।' কিন্তু এই রসের উপলব্ধিক্রম বিবেচনা করে দেখতে হবে। লৌকিক জগতে যা কারণ ও কার্য, তা কাব্যের ক্ষেত্রে শব্দার্থে সমর্পিত হয়ে বিভাব ও অনুভাব নাম ধারণ করে। সেই বিভাব ও অনুভাব সাধারণীকরণের ফলে সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে সংক্রামিত হয়। তখন তাকে বলে 'সহৃদয়-হৃদয়সংবাদ'। সাধারণীকরণ বা তন্ময়ীভবনের মাধ্যমে সেই বিভাবাদি 'হৃদয়সংবাদ' সামাজিকের চিত্তে 'বাসনা'-রূপে বিদ্যমান বিভাবাদির অনুরূপ স্থায়ী ভাব উদ্রিক্ত করে। সেই উদ্রিক্ত স্থায়ী ভাব সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে ক্রমশঃ প্রবলতর হয়ে সেখানকার সমস্ত বিঘ্ন অপসারণ করে ও তাঁর চৈতন্য বা সচ্চিদানন্দস্বরূপের 'আবরণভঙ্গ' করে। এইভাবে অজ্ঞানের আবরণ ভঙ্গ হলে সহৃদয় সামাজিকের সচ্চিদানন্দস্বরূপ বা চৈতন্যস্বরূপের নির্মল প্রকাশ হয়। অভিনবগুপ্তের মতে, সহৃদয় সামাজিকের সচ্চিদানন্দস্বরূপের আবরণভঙ্গ ও নির্মল প্রকাশকেই রসানুভব বলে। যেহেতু বিভাবাদির সঙ্গে সাধারণীকরণের মাধ্যমে এবং বিঘ্নাপসারণের সাহায্য সামাজিকের চিত্তের আবরণ-আবৃত সচ্চিদানন্দের আবরণভঙ্গ করা ও আনন্দাংশের অভিব্যক্তি সাধন করা কাব্যের লক্ষ্য, সেইজন্যই অভিনবগুপ্তের কাব্যতত্ত্বকে অভিব্যক্তিবাদ বলা হয়।

অভিনব গুপ্ত সিদ্ধান্ত করেছেন যে, বিভাবাদির সংযোগে সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে 'বাসনা'-রূপে স্থিত স্থায়ী ভাবের উদ্রেক ও নিষ্পত্তিকেই 'অভিব্যক্তি' বলে। আর সেই 'অভিব্যক্তিই' হচ্ছে ভরতের 'রসনিষ্পত্তিঃ' কথাটির তাৎপর্য। শুধু তাই নয়, তিনি গুরু ভট্টতোতের যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, রসের আশ্রয়স্থল ভট্টলোল্লট কথিক অনুকার্য পাত্র-পাত্রী নয়, ভট্টশঙ্কুক-কথিত অনুকর্তা নট-নটী নয়, তার আশ্রয়স্থল ভট্টনায়ক-আনন্দভর্ধন-কথিত সহৃদয় সামাজিকের হৃদয়।

## ৯। ঔচিত্যতত্ত্ব :

কাব্যসৃষ্টির কতকগুলি নিয়ম আছে। সেই সব নিয়মের ব্যতিক্রমে কাব্যে দোষের সঞ্চার হয়। সাহিত্য-দর্পণে উদ্ধৃত একটি বচনানুসারে সেই দোষ হচ্ছে কাণের ফুটোর মতো– 'দোষাঃ কাণত্বাদিবৎ।' কাব্যে যত রকমের দোষ দেখা যায় তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে অনৌচিত্য দোষ। তাই আনন্দবর্ধন বলেছেন– 'অনৌচিত্য ছাড়া রসভঙ্গের আর কোনো কারণই নেই।' নিয়মের ব্যতিক্রম যদি অনৌচিত্য নামক দোষ হয়, তবে নিয়ম পালনের তত্ত্বটির নাম কি হবে ? আনন্দবর্ধনের মতে, সেই নিয়ম পালনের তত্ত্বটির নাম হবে 'ঔচিত্য' এবং সেই 'ঔচিত্যতত্ত্ব' হবে রসতত্ত্বের পরম 'উপনিষৎ'।

আলংকারিকদের আলোচনা অনুসরণ করলে বোঝা যায়, কবি যে রস প্রতিপাদন করতে চান সেই অভীষ্ট রসের উপযোগিতাই হচ্ছে 'ঔচিত্য'। মনে রাখতে হবে, প্রসঙ্গানুযায়ী অভীষ্ট রসের উপযোগিতা বিচার করতে হয়। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। একজন রাজা যতই মহিমান্বিত হোন তিনি মানুষ। সেই মানুষ-রাজার কার্যকলাপ অবলম্বন করে কোনো কবি বীররসের সঞ্চার করতে চান। সেই অভীষ্ট বা অভিপ্রেত রস প্রতিপাদন করতে গিয়ে তিনি যদি রাজার সপ্তসমুদ্রলঙ্ঘনের বর্ণনা দেন তবে তা প্রসঙ্গানুযায়ী উপযোগী হবে না। কারণ রাজা মানুষ বলেই তাঁর সপ্তসমুদ্রলঙ্ঘনের ব্যাপার অসম্ভব ঘটনা বলে মনে হবে এবং তা বিশ্বাসযোগ্যতা ও ঔচিত্যের সীমা পেরিয়ে যাবে। এক কথায়, অসম্ভবের বর্ণনা দিয়ে শৃঙ্গাররসের সৃষ্টি করা। কিন্তু কবিশক্তির অভাববশতঃ তা হয়ে দাঁড়ালো গ্রাম্যশৃঙ্গাররসের বর্ণনা ('কুমারসম্ভবে' দেবীর সম্ভোগবর্ণনা গ্রাম্য ও অসভ্য হয়ে ওঠেনি; কেননা তা কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসের কবিশক্তির দ্বারা আচ্ছাদিত)। সেই ক্ষেত্রে তা ঔচিত্যের নিয়ম লঙ্ঘন করায় অভিপ্রেত শৃঙ্গাররসের পক্ষে উপযোগী হবে না। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, রসের বিচার করতে হয় ঔচিত্যের নিয়ম অনুযায়ী এবং ঔচিত্যের বিচার করতে হয় প্রাসঙ্গিতার নিয়ম অনুযায়ী। এইভাবে প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে যেমন ঔচিত্যের প্রশ্ন উঠেছে, তেমনি প্রাচীন গ্রীক কাব্যশাস্ত্রেও propriety-র প্রশ্ন উঠেছিলো। স্মর্তব্য, ঔচিত্য ও propriety সমার্থক শব্দ। এই দুই কথারই অর্থ হচ্ছে, এমনভাবে কাব্যের বিষয়বস্তুর বর্ণনা করতে হবে যাতে পাঠকদের প্রতীতির খণ্ডন না হয়।

যতপ্রকার ঔচিত্য আছে তার মধ্যে মূল বা প্রধান হচ্ছে রসৌচিত্য। সেইজন্য আনন্দবর্ধন বলেছেন– 'রসবন্ধ রচনা সম্বন্ধে যে ঔচিত্যের কথা বলা হয়েছে, তাকে আশ্রয়কারী রচনা সর্বত্র দীপ্তি লাভ করে।' তিনি আরও বলেছেন, ঔচিত্য-বিচার রস সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ বিচার। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, কোনো রচনায় রস স্ফূর্তি লাভ করেছে কিনা, না রসভঙ্গ হয়েছে– তা বিচারের একমাত্র মানদণ্ড হচ্ছে সেই রচনা সর্ববিষয়ে ঔচিত্যের নিয়ম অনুসরণ করেছে কিনা তা দেখা। এই রসৌচিত্য প্রসঙ্গে ভরতের অনুশাসনের কথা তোলা যেতে পারে। সেই অনুশাসন অনুসারে দেবদেবীর সম্ভোগশৃঙ্গারের বর্ণনা নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু য়আনন্দবর্ধন স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, দেবদেবীর ক্ষেত্রেও ঔচিত্যের নীতি পরিহার করা চলবে না। তাঁদের চরিত্রানুসারে রসৌচিত্য নির্ধারণ করতে হবে। যদি

দেবদেবীর সম্ভোগশৃঙ্গারের বর্ণনা গ্রাম্য পর্যায়ে নেমে আসে, তবে তাদের রসভঙ্গ হবে। বীর, অদ্ভুত ইত্যাদি সব রসের ক্ষেত্রেই চরিত্রানুযায়ী রসৌচিত্যের বিচার অপরিহার্য।

এই রসৌচিত্যের প্রসঙ্গে সিদ্ধরসের কথা উঠেছে। বলা হয়েছে– 'রামায়ণ প্রভৃতি যেসব কাব্য সিদ্ধরসতুল্য, তাদের কথাতে এমন কথা যোগ করা চলে না, যা তাদের রসের বিরোধী।' অর্থাৎ সিদ্ধরস রসৌচিত্যতত্ত্বের বিচারের মধ্যে পড়ে না। তার কথা আলাদা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সিদ্ধরস কাকে বলে ? অভিনবগুপ্ত বলেছেন– 'কাব্যের যে রস আস্বাদমাত্রে পরিণত হয়েছে, যাকে বিভাবিত করতে হয় না, তা-ই সিদ্ধরস।'

সিদ্ধরসের দৃষ্টান্ত হিসেবে আনন্দবর্ধন রামায়ণের কথা উল্লেখ করেছেন। অভিনবগুপ্ত তাঁর 'লোচন-টীকায়' বলেছেন, ধীরোদাত্ত নায়ক রূপে রামচন্দ্র বহু-পরিচিত। তাঁর সেই পরিচয় এত প্রচলিত যে, তা কেন্দ্র করে একটা স্থির রসের আস্বাদ পাঠকের মনে গেঁথে গেছে। তাকেই বলা যেতে পারে রামচন্দ্র-সম্পর্কিত সিদ্ধরস। কিন্তু কোনো নাট্যকার বা কবি যদি রামচন্দ্রের এমন বর্ণনা দেন যাতে তাঁকে নৃত্যগীতাদিপটু নায়ক বলে মনে হয়, তবে রামচন্দ্র-সম্পর্কিত ঔচিত্য নষ্ট হয়ে গিয়ে সিদ্ধরসের ব্যতিক্রম ঘটবে। কিংবা ধরা যাক্ আধুনিক কালের নূতন রামায়ণকাব্য 'মেঘনাদবধকাব্যে'র কথা। এই কাব্যে রামচন্দ্রকে ভীরু ও দুর্বল চরিত্র রূপে দেখানো হয়েছে। ছেলেবেলা থেকে রামায়ণের রাম-সীতার কাহিনী শুনতে শুনতে বা পড়তে পড়তে রামচন্দ্রের যে ঐতিহ্য-মূর্তি ও রসমূর্তি আমাদের মনে গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে 'মেঘনাদবধকাব্যে'র রাম-চরিত্রের কোনো মিল নেই। সুতরাং একথা বলতেই হবে যে, মধুসূদন রাম-চরিত্র-চিত্রণে সিদ্ধরসের ব্যতিক্রম বা বিপর্যয় ঘটিয়েছেন। এই সব কারণেই আনন্দবর্ধন বলেছেন, রামায়ণ প্রভৃতি যে সমস্ত কথা-কাহিনী সিদ্ধরস-আখ্যান রূপে প্রখ্যাত তাদের সঙ্গে সিদ্ধরস-বিরোধী কবির ইচ্ছা (অর্থাৎ কোনো কিছু কাহিনী) যুক্ত করা উচিত নয়। বলা বাহুল্য, এ-সমস্তই হচ্ছে রসৌচিত্যের নিয়ম রক্ষার কথা।

রসতত্ত্বের চরম কথা যেমন সচ্চিদানন্দস্বরূপ বা রসস্বরূপের অভিব্যক্তির কথা, তেমনি ঔচিত্যতত্ত্বের চরম কথা হচ্ছে রসৌচিত্যের কথা। কাব্যকলার রসৌচিত্য নির্ভর করে বিভাবৌচিত্যের (বিভাবগত ঔচিত্যের) ওপর। বিভাবৌচিত্য (ভাবৌচিত্য বা প্রকৃত্যৌচিত্য এরই অন্তর্গত) কাকে বলে ? কাব্যের যা কারণ ও কার্য তা যদি বিভাব-অনুভাব হয়ে থাকে তবে বিভাবাদির ঔচিত্যের অর্থ দাঁড়ায় কার্যকারণের ঔচিত্য। সোজা ভাষায়, কাব্যের বিষয়বস্তুর ঔচিত্য। কাব্যের রসৌচিত্য নির্ভর করে ওই বিষয়বস্তুর ঔচিত্যের ওপর। কাব্যের বিষয়বস্তু বা কথাবস্তু ইতিহাসগত কিংবা কবি-কল্পিত দুই-ই হতে পারে। কিন্তু সেই বিষয়বস্তু যেখান থেকেই আসুক না কেন, তা যদি ঔচিত্যের নিয়ম মেনে চলে তবেই রসের অভিব্যঞ্জক হয়। সেজন্য আনন্দবর্ধন বলেছেন– 'কবি বিভাবাদির ঔচিত্য থেকে বিচ্যুতি পরিত্যাগে যত্নশীল হবেন।' মনে রাখতে হবে, বিষয়বস্তু বা বিভাবাদির ঔচিত্য ছাড়া রচনার রসবত্তা হতে পারে না। অভিনবগুপ্তও বলেছেন, (বিষয়বস্তুর) এমনভাবে বর্ণনা করতে হবে যাতে পাঠকদের প্রতীতি খণ্ডন না হয়।

আর এক প্রকার ঔচিত্য আছে এই রূপৌচিত্য বলতে শব্দার্থরূপ বা কাব্যশরীর বা কথা শরীরে ঔচিত্য বুঝতে হবে। আরও সহজ ভাষায় বলা যায়– বর্ণ, পদ, বাক্য, ছন্দ, অলংকার, প্রবন্ধ ইত্যাদির সমবায়ে যে কাব্যশরীর নির্মিত হয় তা অভিপ্রেত রসের অনুকূল হচ্ছে কিনা তা বিচার করে দেখতে হবে। রসসৃষ্টিতে এদের দান ও উপযোগিতা নির্ণয়ই রূপৌচিত্য নির্ণয়ের আসল কথা। সুতরাং ঔচিত্যতত্ত্বে নিম্নক্রমে প্রথমে আসে রসৌচিত্যের কথা, তারপর বিভাবৌচিত্যের কথা, সর্বশেষে রূপৌচিত্যের কথা। আর ঊর্ধ্বক্রমে রূপৌচিত্য থেকে শুরু করে রসৌচিত্যে গিয়ে পৌঁছোতে হয়। ক্রম যা-ই হোক্, ঔচিত্যতত্ত্ব যে কাব্যতত্ত্বের একটা বড়ো কথা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

**অনুশীলনী :**

**বিস্তৃত প্রশ্ন –**

১। অলঙ্কারবাদ সম্পর্কে যুক্তি সহ আলোচনা করো।
২। রীতিবাদ সম্পর্কে যুক্তি সহ আলোচনা করো।
৩। রসের উপাদানগুলি কি কি ? প্রত্যেকটি উপাদানের উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করো।
৪। রসসূত্র সম্পর্কে যে চারটি মতবাদের প্রচলন রয়েছে, তা দৃষ্টান্ত সহ আলোচনা করো।
৫। ঔচিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা করো।
৬। 'রস কাব্যের আত্মা' – যুক্তি সহ মন্তব্যটির বিশ্লেষণ করো।

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন –**

১। প্রাচ্য রীতি ও পাশ্চাত্য স্টাইল সম্পর্কে আলোচনা করো।
২। ঔচিত্য কয়প্রকার ও কি কি ? দৃষ্টান্ত সহ আলোচনা করো।
৩। টীকা লেখো : সাধারণীকরণ
৪। বিশ্লেষণ করো– 'রস ও কাব্যের জগৎ অলৌকিক মায়ার জগৎ।'
৫। ধ্বনি কাকে বলে ? বিভিন্ন প্রকার ধ্বনি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।
৬। বিভাব ও অনুভাবের পার্থক্য নির্দেশ করো।